তৃতীয় অধ্যায়

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল - সমর সেন

ষোল বছর বয়সে স্কুলে পড়াকালীন মার্কস একটি রচনা লিখেছিলেন 'হাউ ইয়ংম্যান চুজ দেয়ার প্রফেসনস', এই রচনাটিতে মার্কস দেখিয়েছিলেন কিভাবে প্রকৃতি আর পরিবেশ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বয়সে তিনি মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাবকেই বড় করে দেখতেন। তিনি বলেছিলেন-

"মানুষ যে পরিবেশে জন্মগ্রহন করে সেই পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে উঠে তার জীবন আর জীবিকা, সেই প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে না।"[১]

যদিও পড়ে তিনি এই ভাবনা পরিবর্তন করেন এবং এই পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভেঙেচুড়ে নতুন রূপদানের কথা বলেছেন। সে প্রসঙ্গে আমরা এখন যাব না। তিনি পরে সংগ্রামের কথা বলেছেন ঠিক কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের ভাবনা তাকেও আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি না। পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে বলেই তিনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেছেন। বাংলা কবিতার জগতে এই পরিবেশের প্রভাব কিন্তু অসম্ভব ভাবে পরেছে। বিশেষ করে তিরিশের দশক থেকে শুরু করে, এবং চল্লিশের দশকে তা যেন বাঁধ ভাঙা নদীর মতো উপচে পড়েছে বাংলা কবিতায়। আসলে প্রকৃতিতো কবিতার প্রধান অবলম্বন, এখন প্রকৃতি যদি ঘন ঘন ক্ষত বিক্ষত হয়, রক্তাক্ত হয় তাহলে

কবিতায় তো সেই রক্তের দাগ লাগবেই। সমর সেনের কবিতা তার ব্যতিক্রম নয়। তাই সমর সেনের কবিতায় যাওয়ার আগে তাঁর সময়, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর পরিবেশকে একটু দেখা নেওয়া যাক।

একান্নবর্তী পরিবারে বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনে অরুণচন্দ্র সেন ও চন্দ্রমুখী দেবীর তৃতীয় সন্তান সমর সেন ১৯১৬ সালের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহন করেন। পিতামহ ছিলেন খ্যাতনামা বাঙালি পন্ডিত গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন। পিতা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ এবং অন্য দুটি কলেজে পড়িয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। বাবা-মায়ের সর্ম্পক খুব ভাল ছিল না, তা তাঁর নিজের বর্ণনা থেকেই জানা যায়-

*"বাবা-মা'র দাম্পত্য জীবন শেষের দিকে খুব সম্ভব সুমধুর ছিল না, ক্রমাগত রোগে ভুগে মা'র মেজাজ হয়ে গিয়েছিল খিটখিটে, আমাদের ধমকাতেন কারণে-অকারণে, সংসারে কেমন যেন তিতি-বিরক্ত হয়েগিয়েছিলেন। ---উনুনের সামনে বসে থাকতেন মাথায় হাত দিয়ে অসহ্য মাথা ব্যথা, তবু রান্না করা চাই। মা'র মৃত্যু কালে ভাইবোন মিলিয়ে আমরা ন'জন, ছ'ভাই, তিন বোন। আমি তৃতীয় সন্তান, আমার উপরে দু'ভাই। মা'র মৃত্যুকালে সবচেয়ে ছোটো বোন ছিল তিন মাসের।"*২

মা অল্প বয়সেই মারাযান বলে সমর সেন তেমন ভাবে মায়ের আদর স্নেহ ভালোবাসা পাননি। নভেম্বর ১৯২৮সালে মা মারা যান, এতে তিনি খুব হতাশ হন এবং মা'র মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর ভগবানের প্রতি বিশ্বাসও হারিয়ে যায়। মা মারা যাওয়ার সেই রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

"তিন তলার ঘরে মশারির নিচে ঘুমোচ্ছি, বেশ রাতে আমাদের দোতলার ঘরে ডাকা হল। মা'র তখন নাভিশ্বাস, কথাবার্তা বন্ধ, এক একবার চোখ মেলে ছেলে মেয়েদের দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। বিছানায় শুয়ে প্রার্থনা করলাম –'ভগবান, তুমি থাকলে মা বেঁচে যাবেন। ভোর বেলায় মা মারা গেলেন।। ভগবান নিয়ে অতঃপর মাথা ঘামাইনি।"৩

সমর সেনের ছোটোবেলা থেকেই স্মরণশক্তি প্রখর ছিল। বাড়িতে বেশ পড়াশোনার পরিবেশও ছিল, তিনি ছোটোবেলা থেকেই বাংলা, ইংরেজী কবিতা শুনেশুনেই মুখস্থ করে ফেলতেন এবং বাড়িতে অতিথি আসলে ঠার্কুদা তাকে দিয়ে অতিথিদের সামনে তা আবৃত্তি করাতেন। এবং এই বয়সেই তিনি অনেক নিষিদ্ধ বইও পড়েফেলেন-

"সন্ধেবেলায় মা গা ধুতে গেলে খাটের নিচে টর্চ জ্বালিয়ে অনেক নিষিদ্ধ বই পড়ে ফেলি। তার আগে গীতার শ্লোক শুনে মুখস্থ করতে পারলে কয়েকটি শ্লোক পিছু মা'র কাছে পয়সা পেতাম, যেমন পেতাম তাঁর পাকা চুল বেছে।"৪

শুধু বই পড়া নয় বাড়িতে একটা বিপ্লবী পরিবেশও দেখেছেন ছোটোবেলা থেকেই। বিপ্লবীদের বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল, পুলিশের তল্লাশিও হয়েছে অনেকবার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদেরও যাওয়া আসা ছিল। তিনি বলেছেন-

"রাজনীতিতে, বিশেষ ক'রে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে উৎসাহ ও আগ্রহ তখন তীব্র। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ইত্যাদি আলোড়ন এনেছিল। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে আস্থা ছিল না। আ-সময় বোধ করি মার্কসবাদী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

ও রাধারমণ মিত্রকে প্রথম দেখি। রাধারমণবাবু মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আসতেন।"৫

সমর সেন ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে স্কটিশ চার্চে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে আই. এ পাশ করেন, এই কলেজ থেকেই ইংরেজি নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩৬ সালে বি. এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে এম. এ তেও প্রথম স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন। নয় ভাই-বোনের মধ্যে সমর সেনের মেধা ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী। বিপ্লবী রাধারমণ মিত্র তাঁর সর্ম্পকে বলেছেন-

"মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ছাড়া পেয়ে এসে আমি তখন উঠেছি অরুণের কাছেই। সমর সে সময় এম. এ –র জন্য প্রিপারেশেন করছে। এক দিন ওর একটা লেখা পড়ে আমি অবাক, দেখি অসাধারণ ইংরেজি। এমনিতে ও ছিল, বরাবরের মতন, কিছুটা বাউণ্ডুলে। কথা বেশি বলত না কোন দিন। লেখায় যেমন, কথাবার্তাতেও ওর সংযম ছিল তেমনি চোখে পড়ার মতন। অদ্ভুত সেন্স অফ্ হিউমার, কুট্টুস করে কিছু কিছু মন্তব্য-সব দিক থেকেই ও ছিল আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা।"৬

ছোটবেলা থেকেই সমর সেন বামঘেঁষা রাজনীতি চর্চার সূত্রে রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। যদিও এর সবচেয়ে বড় কারণ তাঁর বাড়ির পরিবেশ। পিতা নিজেও কমিউনিস্ট পন্থি। রাজনীতি সংক্রান্ত সভা সমেতিতে মাঝে মাঝে যেতেন সনর সেন কিন্তু পার্টিতে তেমন ভাবে সরাসরি যোগদান করেননি। বিভিন্ন আড্ডাচক্রে বাগ-বিতণ্ডা হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ না করে শুধু শুনতেন। তাঁর মুখেই শোনা যায় 'তিরিশের শেষের বছর কটিতে সাহিত্য ও রাজনীতির একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে, প্রগতি বা ফ্যাসিস্ট

বিরোধী ফ্রন্ট' শুধু সে টুকুই। তিনি নিজে কোন রচনা পাঠ বা বক্তৃতা করতেন না, তার মানে অবশ্যই এটা ছিল না যে তিনি নীরব বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। কারণ তাঁর বাড়িতেই তাঁর বাবার সাথে মাঝে মাঝে কমিউনিস্ট, হিটলার, মুসোলিনি নিয়ে বিবাদ বেঁধে যেত। 'বাবু বৃত্তান্তে' তিনি লিখেছেন-

*"গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে রাজনীতি নিয়ে বাবার সাথে ক্রমাগত বচসাবির্তক হত; হিটলার নুসোলিনির হাতে ইংরেজরা অপদস্থ হলে আমরা বিচলিত বোধ করতাম না, কিন্তু নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে আমাদের সমর্থন ছিল না। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষ বোসের বিরোধে আমরা ছিলাম সুভাষবাবুর পক্ষে। কিন্তু সুভাষবাবু সাম্যবাদ ও ফ্যাসিজম্ –এর একটা সমন্বয়ের কথা তোলেন। অন্য দিকে নেহেরু অক্লান্ত ভাবে হিটলার ও মুসোলিনির বিরোধিতা করেন সে কারণে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নেহেরুর প্রতিপত্তি প্রখর ছিল। বাবা ফরোয়ার্ডব্লকের অনুরাগী হন। মাঝে মাঝে আমাদের মতান্তর এমন স্তরে পৌঁছতো যে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার কথা ভেবেছি।"*৭

এইভাবে যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে সমর সেনের চেতনার স্তর সমৃদ্ধ হয়। তিনি বিনা যুক্তিতে কোন কিছুকেই মেনে নেননি। প্রতেক্ষ্য ভাবে রাজনীতি না করলেও তিনি কিন্তু রাজনীতি সর্ম্পকে উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে এম. এ পাশ করে কিছু দিন এই রাজনীতির ব্যাপারে দ্বিচারিতার মধ্যে ছিলেন। নির্বাচনের জন্য তিনি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আসানসোল যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি রাজনীতির দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হন এবং সিদ্ধান্ত নেন-

"কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদেবার চেষ্টা করবো কিনা গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না। বক্তৃতা আমার একেবারে আসে না, তার চেয়ে মাঝে মাঝে 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে

*বিবেক সাফ থাকবে। আমাকে কর্মী হিসেবে নিলে পার্টীর বিশেষ কোন লাভ হবে না।"*৮

তিনি জানতেন বিপ্লবী কাজ যে সহজ সাধ্য নয়। তাই তাঁর সরল স্বীকারোক্তি-

*"আমার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।"*৯

কারণ তিনি জানতেন বিপ্লব এত সহজ জিনিস নয়, কারণ সে সময় বাস্তব ছিল বড় কঠিন, আর বাস্তবকে বদলানো মানে সে সময় মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। তাই তিনি তাতে সেভাবে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেননি। যাই হোক সমর সেন কিন্তু কবিতার প্রতি তরুণ বয়স থেকেই ঝুঁকে ছিলেন। কবিতাকে তিনি কিভাবে দেখেছেন সে সময় তা তাঁর বর্ণনাতেই পাওয়া যায়-

"বয়স আর একটু বাড়লে কবিতার দিকে মন গেল। রাজনীতিতে তখন গরম হাওয়া। রবীন্দ্রনাথকে মনে হত জোলো। ফৌজি কবি যিনি জেল খেটেছেন, যাঁর কয়েকটি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে-অর্থাৎ নজরুল-আমাদের বিপ্লবী নায়ক ছিলেন। এদিকে বয়সের দোষ কল্লোল কালিকলম ইত্যাদি পত্রিকা চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে শুরু করল। এঁদের লেখকরাও তো এক হিসেবে বিপ্লবী, স্থবির ভণ্ড সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। অনেক পংক্তি মুখস্থ হয়ে গেল : 'কাহার চুম্বন কাহারে দিয়াছি কিছু তো নাই মনে' (চুম্বনের পাত্রী অবশ্য তখন বড়ো একটা পাওয়া যেত না)-যা সমাজব্যবস্থা, 'ক্ষয়হীন রাতি গোঙাইনু দোঁহে অক্ষয় তৃতীয়ায়'। সবচেয়ে বিচলিত করল বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর-বন্দনা

: 'রাতিক্লান্ত রমণীর কেশের মতন', 'রমণী-রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি' (বিনয় কেন?), বেপাড়ায় গিয়ে 'কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা'।"১০

আর এই বুদ্ধদেব বসুর সূত্রেই সমর সেন হয়ে ওঠেন আধুনিক কবিতা আন্দোলনের একজন। আর এইভাবেই তিনি বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় যে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকা বের হত তার সহকারী সম্পাদক হয়ে যান এবং কিছু বছর পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বদলে সমর সেনের নাম বুদ্ধদেব বসুর সাথে সম্পাদকের জায়গায় প্রকাশ পায়। এই কবিতা পত্রিকায় সমর সেনের কিছু কবিতা প্রকাশ পায় আর তা রবীন্দ্রনাথ পড়েন, এবং সমর সেনের এই কবিতা গুলি সর্ম্পকে বুদ্ধদেব বসুকে এক পত্র লেখেন সেখানে তিনি বলেন-

"সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। ---সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।"১১

যাইহোক এভাবেই সমর সেনের কবি জীবন শুরু হয় কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা তা হল তাঁর কবি জীবন বেশি দিন সচল থাকেনি। তিনি নিজেই তাঁর কবি জীবন সর্ম্পকে বলেছেন-

"আমার কবিতা রচনার আয়ু অবশ্য বারোবছর-১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রথম বই কয়েকটি কবিতা বের করি ১৯৩৭-এ স্বর্ণপদক বেচে, উৎসর্গ করি মুজফফর আহমেদকে। আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ – ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম। কয়েকটি কবিতার সমালোচনা করেন বুদ্ধদেববাবু, বিষ্ণুবাবু এবং ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যথাক্রমে 'কবিতা', পরিচয় ও

অমৃতবাজার পত্রিকা'য়। ১৯৪০-এ প্রকাশিত হয় গ্রহণ, ১৯৪২-এ নানাকথা, ১৯৪৩-এ খোলাচিঠি, ১৯৪৪-এ তিনপুরুষ ও ১৯৫৪-এ সমর সেনের কবিতা (সিগনেট প্রেস)।"[১২]

১৯৩৭ সালে সমর সেনের প্রথম কবিতার বই 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশ পায়। এই কবিতা গ্রন্থের সব গুলি কবিতাই তাঁর আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সে লেখা। এছাড়াও এই কবিতা গ্রন্থের আরেকটি বিশেষত্ব হল এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্টকে, যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঘটনা। যাকে উৎসর্গ করা হয় তিনি হলেন মুজফফর আহমদ। আমরা সকলেই জানি সমর সেন অস্বস্তিকর আধুনিক নগর জীবনের কবি। তাঁর কবিতার মূল দর্শণ তিনি তাঁর "In defence of the Decadents" প্রবন্ধটিতে বলেছেন-

"In these times of dereliction and dismay of wars, unemployment and revolutions, the decayed said of things attracts us most.The boredom and the horror, rather than glory of life, is our immediate reality. Parhaps that is because we have our roots deep in the demoralized petty bourgeoisie and lack the vitality of a rising class. It is best to admit this and write above the class you know well than to exult in the future glories of a classless society," [১৩]

আর তাই তাঁর প্রথম কবিতাতেই দেখি সেই ক্লান্তির, সেই অবক্ষয়ের ছবি। সেখানে তিনি বলেন-

“অন্ধকার নেমে এল

পাড়হীন, নিঃশব্দ স্রোতে :

চাপা রক্তে ক্লান্ত পশ্চিমের আকাশ,

আর দগ্ধ রজনীগন্ধার

উপরে সন্ধ্যার স্তব্ধ হাসি।

--- --- ---

নির্জন অন্ধকারে

স্পন্দমান মুহূর্ত কী যেন বয়ে আনে

কী যেন প্রতিক্ষণে মনে পড়ে;

শুধু যেন শুনি,

ক্লান্তভাবে শুনি আর শুনি-

সুদূর বিরহের করুণ পদধ্বনি।”

(‘গোধূলি’, ‘কয়েকটি কবিতা’)

এই কবিতায় ব্যবহৃত কিছু বিশেষণ যেমন ‘ক্লান্ত’, ‘স্তব্ধ’, ‘দগ্ধ’ এসবের ব্যবহারে অনেকেই বলেছেন এখানে কবি প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই প্রিয়া বিরহ এবং তাঁর মনের বিরহ বেদনা মিলেমিশে এই কবিতার জন্ম। যাইহোক আর যে কারণেই হোক দেখার বিষয় এটা যে কবি শুরুই করলেন

হতাশা, ক্লান্তি, ব্যর্থতা দিয়ে। আর এটাই ছিল চল্লিশের দশকের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক। এই কবিতা গ্রন্থ সম্পর্কে মাহবুবুল হক বলেছেন-

"সমর সেনের ১৯৩৪-৩৭ কালপর্বের কবিতা সংকলিত কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থে কবির অশান্ত, যন্ত্রণাময়, ক্ষুব্ধ যে-যৌবনের পরিচয় আমরা পাই সে-যৌবন উন্মোচিত হয় এমন এক নগরে যার মাথার উপরে উদ্যত আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রুর শাণিত থাবা, যার প্রতি অঙ্গে ফুটে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী বণিক সভ্যতার শাসন-শোষণের পরিণাম-লক্ষণ এবং অনির্দেশ্য অবক্ষয়-যাত্রার নানা ক্ষতচিহ্ন। তিরিশের কাব্য আন্দোলনের বিষয় ও ভাবধারণাকে স্পর্শ করেও এখানে সমর সেন অনিকেত, নিঃসঙ্গ এবং এক বিপন্ন সময়ের শিকার।"[১৪]

পুঁজিবাদী সভ্যতার ফলে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে যে অবক্ষয় যে ক্লান্তির ছায়া পড়েছিল এবং তার ফলে সমাজের যে পরিস্থিতি হয়েছিল তা সমর সেনের কবিতায় যে ভাবে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল তা কিন্তু সমসাময়িক অন্য কোন কবির কবিতায় তেমন ভাবে ফুটে ওঠেনি। জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আমরা যদিও কিছু কিছু পারিবারিক সমস্যার কিছু ক্ষয়িষ্ণু চিত্র পাই, তবে নগরজীবনের ভাঙনের যে রূপ এবং তার ফলে মানব জীবনের যে প্রতিক্রিয়া, তা কিন্তু সবচেয়ে গভীর এবং মর্মস্পর্শী ভাবে ধরা পড়েছে সমর সেনের কবিতাতেই। এই প্রসঙ্গে মাহবুবুল হক বলেছেন-

"বস্তুত সমকালীন নগর জীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, চরম শৈথিল্য, অসুস্থ মনোবিকার, যান্ত্রিক জীবন-সম্ভোগের অপরিসীম ক্লান্তি, জীবনবোধের ক্ষেত্রে আদর্শিক চেতনার স্খলন, অনিশ্চয়তা-জনিত অস্থিরতা, সমস্যা-সংকুলতার মুখে ক্রমবর্ধমান জীবন-বিতৃষ্ণ

মনোভাব ইত্যাদি যে-সব লক্ষণ সমকালীন কলকাতায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিল সেই অবক্ষয়গ্রস্থ সামাজিক পরিবেশের ছবিই অনুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছিল সমর সেনের কবিতায়। তিরিশের দশকের অন্যান্য আধুনিক কবি সেই একই পরিবেশে বসবাস করলেও তাঁদের কবিতায় এ ধরনের নাগরিক চেতনা দেখা যায় না।" ১৫

যে পুঁজিবাদ সমাজকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ যে সাম্যবাদ তা কিন্তু কবি বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি সমস্যাকে নির্ধারণ করেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সমস্যা সমাধানের পথ দেখান। কার্ল মার্কসের কবিতার অনুবাদও তিনি করেছিলেন-

"হৃদয়কে যা জাপটে ধরে কঠিন শক্তিতে

ধীরে-সুস্থে তার মোকাবিলা পারব না কখনো,

অস্থির অশেষ যাত্রায়

এগিয়ে যেতে হবে দ্বন্দ্বে পথ করে।

যা-কিছু অনবদ্য, যা-কিছু সুন্দর

আমার জীবনে আনব

ভেদ করব বিজ্ঞানের জগৎ

শিল্প ও সংগীতের রসে হব মুখর।"

('কার্ল মার্কস ৩', 'সংকলিত সমর সেন')

আরেকটি কবিতার বিষয়বস্তু ছিল ঠিক একইরকম। সেখানেও আমরা পাই সংগ্রামের কথা, সংঘাতের কথা, বিপ্লবের কথা। সেখানে তিনি বলেন-

"সাধ্যসীমার পরোয়া না-করে চলো

সংঘাত-থেকে-হটা কখনো নয়

ইচ্ছাশক্তিবর্জিত স্থবিরের মতো

বেঁচে-থাকা কখনো নয়।

যন্ত্রণা আর খাটুনির জোয়ালে

শান্তভাবে কাঁধ গলানো ? ধিক!

যা হবার হোক, আমাদের আছে

অশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম ও প্রয়াস!"

('র্কাল মার্কস ৪', 'সংকলিত সমর সেন')

সমর সেন মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একের পর এক কবিতায় তুলে ধরলেন মানুষের নৈরাশ্য, হতাশা, স্থবির জীবনকে। তাঁর এই জীবন যাত্রার প্রকাশকে দেখে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন-

"নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেক দিন; কিন্তু আমদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখালবালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খন্ড-খন্ড ছবি বা উল্লেখ কোন-কোন আধুনিক কবিতে থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি,

কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।"[১৬]

আর এই শহরের চিত্র পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে তাঁর 'নাগরিক' কবিতায়-

"মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি

আর দিন

সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,

দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,

হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;

আর রাত্রি

রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের

মুখর দুঃস্বপ্ন।

--- ---- ---

মাঝে-মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,

দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়;

কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে!

কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত

বন্যা আর দুর্ভিক্ষ

শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

সন্ধ্যার সময়,

রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে

মাঝে-মাঝে আকাশে শুনি

হাওয়ার চাবুক,

আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি-

চারিদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।"

('নাগরিক', 'কয়েকটি কবিতা')

আর এই প্রসঙ্গে শুধু বুদ্ধদেব বসুই নন, অমলেন্দু বসু বলেছিলেন-

"বণিকের মানদণ্ডে পিঙ্গল প্রহারে পর্যদস্ত মহানগরীর সর্বৈব বিকৃতি'র চিত্র। এই বিকৃতি সেখানে সমাজব্যবস্থার আপন ক্ষয়কারী প্রভাব বিস্তার করে। ---কলকাতায় কবি সমর সেন দেখেছেন মহানগরীর ক্লিষ্ট অসুন্দর রূপ। ---ক্ষয়, ক্ষয়, ক্ষয়, বিকৃতি, ক্লান্তি, দুঃস্বপ্ন, হাহাকার, মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন, মৃত্যু-যন্ত্রণা-এই কলকাতা শহর। মনে পড়ে উনিশ শতকের শেষ দিককার কবি জেমস টমসনের লন্ডন নগরী সিটি অব্ ড্রেডফুল নাইট।"[১৭]

আর এঁদের সঙ্গে তাল রেখে ঐ একই সুরে একটু সংযোযন করে অশ্রুকুমার শিকদার বললেন-

"আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি সমর সেন, একথা বললেও আপাতদৃষ্টিতে যা চোখে পড়ে তার বেশি বলা হলো না। তিনি বাস্তব-শহরের কবি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা তিনি প্রতীকী শহরের কবি।--- সমর সেন শহরের কবি, কিন্তু যে কোন শহরের নয়, ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার ফল যে

আধুনিক শহর তিনি তার কবি, কারণ তিনি বর্তমান সভ্যতার বিষণ্ণ বন্ধ্যাত্বের কবি।"[১৮]

টি. এস. এলিয়টের কবিতায় যেমন ১৯২০ দশকে ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয়, ক্লান্তি, বিষাদ ছায়া ফেলে গিয়েছিল, তেমনি সমর সেনের কবিতাতেও ছায়া ফেলেছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবক্ষয়, ক্লান্তি, বিষাদ। তাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতাতেই পাই এসবের ছায়া। 'দুঃস্বপ্ন' কবিতায় তিনি বলেন-

"মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে যায়

মধ্যরাত্রে।

বাইরে এসে দেখি

তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ-

আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে;

সে-হাওয়া শুধু যেন শুনি,

কান পেতে শুনি-

কোন্ সুদূর দিগন্তের কান্না;

সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি,

আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার।

অন্ধকারের মতো ভারি তোমার দুঃস্বপ্ন,

তোমার দুস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারি।”

(‘দুস্বপ্ন’, ‘কয়েকটি কবিতা’)

ক্লান্তি, দুস্বপ্ন এসব যেন কবির আসটে-পিষ্টে কবিকে জড়িয়ে রেখেছে। তা থেকে কিছুতেই যেন মুক্ত পাচ্ছেন না। তাই তিনি ‘ক্লান্তি’ কবিতায় বললেন-

“রক্তের জোয়ারে ক্লান্তির স্তব্ধতা এল।

আজ, আলিঙ্গনের শ্লথ বন্ধনে

কী স্বপ্ন যরন বারে-বারে আসে,

সে-স্বপ্ন দেহের অবরুদ্ধ অন্ধকারে

চকিতে ভিজে ফুলের গন্ধ আনে,

আর আমার ক্লান্ত চোখে ঘুম আসে না।”

(ক্লান্তি’, ‘কয়েকটি কবিতা’)

এই বন্ধ্যা সময়কে কবি তুলনা করেছেন মরুভূমির সাথে। যে সময় কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, সব পাখিরা গেছে মড়ে, সব হরিণ গেছে হারিয়ে, চারি দিকে শুধু অন্ধকার, তাই ব্যথিত হৃদয়ে কবি বলেন-

“সমুদ্র শেষ হলো,

আজ দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে

উড়ন্ত পাখির মতো,

সমুদ্র শেষ হলো :

গভীর বনে আর হরিণ নেই,

সবুজ পাখি গিয়েছে মরে,

আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে

দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে

উড়ন্ত সাপের মতো।

সমুদ্র শেষ হলো

চাঁদের আলোয়

সময়ের শূন্য মরুভূমি জ্বলে।"

('১৯০০', 'কয়েকটি কবিতা')

বুদ্ধদেব বসু, সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নিজের 'বন্দীর বন্দনা'র সাথে তুলনা করেছেন এবং 'কয়েকটি কবিতা'কে 'বেশি আধুনিক' বলেছেন। তিনি বলেছেন যে 'বন্দীর বন্দনা'তে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্রোহ কিন্তু সমর সেনের কবিতাতে ছিল সামাজিক বিরোধ। তিনি বলেছেন-

"যে-রকম বয়সে সমর সেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' লিখেছেন, সে-রকম বয়সেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতা গুলি লিখেছিলুম; এই দুই নবযৌবনের কাব্য মনে-মনে তুলনা করতে ভাল লাগছে। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে; তুলনা করলে এইটেই দেখা যাবে যে 'কয়কটি কবিতা' কালপ্রভাবে কিছু বেশি 'আধুনিক', এবং লেখকের স্বভাবের প্রভাবে কিছু বেশি

সীমাবদ্ধ। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ ছিল ব্যক্তিগত ও মানবিক, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, আর বিধাতাকে, অভিশাপ দেবার জন্যও, কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের; আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। সৌন্দর্যের শত্রু, তাঁর মতে, মানুষের আত্মার কলুষ নয়, সামাজিক দুরবস্থা। তাকে মেরেছে ধনিকের লোভ, নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঙ্কিল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্তরা, তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক জীবনে বণিক-শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ-এক অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে নষ্ট হয়ে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন করে?" ১৯

তাই সমর সেন 'উর্বশী' কবিতায় বলেছিলেন-

"তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে

দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!

কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,

হে ক্লান্ত উর্বশী,

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষন্নমুখে

উর্বর মেয়েরা আসে:

কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,

কত দীর্ঘশ্বাস,

কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো, আর কত দিন!"

('উর্বশী', 'কয়েকটি কবিতা')

মানুষ কি চেয়েছিল আর কি হল তার পরিণতি, মানব জীবনের পরিণতির এই যে গ্লানিবোধ, সমর সেনের কবিতায় পাই তারই পরিচয়। মানুষের বহু শ্রম, বহু প্রচেষ্টার ফল আজকের এই সভ্যতা, কিন্তু পুঁজিবাদী বণিক সভ্যতা এসে তাকে তচনচ করে দিচ্ছে, তাতে সমর সেন খুবই ব্যথিত হয়েছেন, আর তাই মানুষের যন্ত্রণা, গ্লানি, বিষাদ, নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার পর কবিতায়। তাই তো ভোরের কলকাতা কবির কাছে কোন নতুনের বার্তা বয়ে আনে না, আনে অসংখ্য মানুষের ক্লান্ত ভরা পদক্ষেপ। তিনি বলেন-

"রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে

সূর্যের অলস উত্তাপে,

তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা

তোমার রক্তে আসে

নীল নদীর মতো।

কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,

পিচের পথে

অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।"

('ভোরের কলকাতা', 'কয়েকটি কবিতা')

কবির কাছে শহর এখন ধূসর হয়ে গেছে, বণিক সভ্যতার ফলে শহর এখন মুমূর্ষু হয়ে গেছে। তাই কবির রাত্রি এখন ভয়ঙ্কর পশুর মতো হয়ে গিয়েছে। তাই কবি 'মরুভূমিতে মৃত্যু : অলকা' কবিতায় বলেন-

"কার নীল চোখে

এখনো সমুদ্রের গভীরতা কাঁপে,

ট্রামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।

আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে

নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে,

ট্রামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।

রাত্রে, চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে

বাঘের চোখের মতো।"

('মরুভূমিতে মৃত্যু : অলকা', 'কয়েকটি কবিতা')

ঠিক একই ভাবে ধূসর শহরের বর্ণনা পাই আরেক কবিতায়-

"ম্লান হয়ে এল রুমালে

ইভিনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ-

হে শহর হে ধূসর শহর!

কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও

লম্পটের পদধ্বনি

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও

হে শহর হে ধূসর শহর!"

('মরুভূমিতে মৃত্যু : স্বর্গ হতে বিদায়', 'কয়েকটি কবিতা')

চল্লিশের দশকে বাংলার আকাশে বাতাসে যে ভাবে মিশে ছিল বারুদের গন্ধ, হাহাকার, হতাশা যেখানে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু নেই, মানুষ শুধু বিষাদে ভুগছে। যেখানে মানুষের প্রেম, যৌবন-বাসনাও বিকৃত হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু এই প্রসঙ্গে খুব সুন্দর করে বলেছেন-

"বাংলাদেশে বিশ শতকের এই চতুর্থ দশকে যে-কবির যৌবনের উন্মেষ হলো কতগুলো তথ্যের প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সে দেখবে তার চারিদিকে মধ্যবিত্ততার নিরেট দেয়াল; তার যৌবনের আবেগ যেদিক দিয়ে বেরোতে চাইবে সেদিকেই ব্যাহত হবে।--- তার পারিপার্শ্বিক একেবারে বেখাপ্পা, এমন-কী প্রতিকূল, তার মনের আগ্নেয় উদ্দীপনাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। শহরে সে দেখবে বৈশ্য আদর্শের আধিপত্য; অর্থ-স্ফীতির কোনো উপায়ই অন্যায় নয়; প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের সংরক্ষণ ও-সম্প্রসারণে ব্যস্ত; ছোটো-ছোটো গণ্ডির দ্বারা রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর দৈহিক ও আত্মিক বিনাশ। আর দেখবে বড়ো-বড়ো নীতিকথার আড়ালে অনাচার, অত্যাচার, যৌবন-বাসনার বিকৃত ও অবমাননা, নিরানন্দ যান্ত্রিক কাজের নিষ্পেষণ আর নিরানন্দ ক্লীব সম্ভোগের ক্লান্তি। কোনোখানে কোনো বড় আদর্শ নেই, নেই মানুষের দেহ-মনের সহজ স্ফূর্তি, সারাটা জীবন যেন এক নিষ্ঠুর নিয়মের ক্রীতদাস। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ও তা থেকে মুক্ত নয়।"[২০]

তাই চল্লিশের দশকের কবি সমর সেন লেখেন 'একটি মেয়ে'র মতো কবিতা-

"আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে

আজ তোমার আর্বিভাব হলো :

স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,

রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,

আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস;

আমাদের কুলষিত দেহে

আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে

সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।"

('একটি মেয়ে', 'কয়েকটি কবিতা')

আর এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় বললেন-

"চোরবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

সকালে কলতলায়

ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে

খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি

মাঝে-মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি-

হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি

আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি

ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।

আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে-মাঝে বলি-

মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও

পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো

হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।

কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে

সকালে ঘুম ভাঙ্গে

আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে

বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।"

(একটি বেকার প্রেমিক', 'কয়েকটি কবিতা')

এই কবিতা সর্ম্পকে বিষ্ণু দে বলেছেন-

"ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হয়ে ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল-শেষ কবিতা একটি বেকার প্রেমিকে-"[২১]

সমর সেনের পরের কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ'। এই কাব্যটি প্রকাশ পায় ১৯৪০সালে। তখন কবির বয়স একুশ থেকে চব্বিশ, এই সময় কবির মন আগের থেকে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তাই তিনি এই কাব্যগ্রন্থের 'পুনরুজ্জীবন' কবিতায় বলেন-

"সেই পুরাতন স্পন্দমান বাসনা আর নেই,

সেই স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান।"

('পুনরুজ্জীবন', 'গ্রহণ')

এরপর আমরা পাই বিদেশী মহাজনদের শোষণে গ্রামের গরীব কৃষকদের যে দুরবস্থা হয়েছে তার বর্ণনা-

"দিন যায়, বসন্ত গতপত্র বহুদিন,

গ্রামে-গ্রামে মাঘমাসে দীর্ঘদেহ কাবুলিরা আসে,

ঘুরে-ফিরে হানা দেয় ঘরেঘরে,

বর্বর ভাষায় কাঁচাপাকা দাড়ি হাওয়ায় নড়ে।"

('কয়েকটি দিন', 'গ্রহণ')

আবার এই কবিতাতেই পাই মড়কের কলরোল, যাতে কবির মনকে করে তোল অস্থির-

"মড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না

চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম!

অতীতের শবসম্ভোগী মন

কালের স্থবির যাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।"

('কয়েকটি দিন', 'গ্রহণ')

'শেষ সন্ধ্যা' কবিতাতেও একই চিত্র, আসন্ন দুর্যোগ ও অসহায়ত্বের ছবি তুলে ধরলেন কবি-

"রুক্ষ মাঠে গ্রীষ্মের কিষাণর গান।

এখানে অসহায় দিন

দূর শ্মশানের গন্ধে, শেষহীন শব্দের পাশে

আসন্ন রাত্রির পদক্ষেপে স্তব্ধ।"

('শেষ সন্ধ্যা', 'গ্রহণ')

এই কাব্যগন্থের 'গ্রহণ' নামক কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে মালিনী ভট্টাচার্য বলেছেন-

" 'গ্রহণ'-এর নাম-কবিতায় যে টাইপের জীবন, আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক...' কিন্তু এই মুমূর্ষু শ্রেণী কোন শ্রেণী? কে এই নায়ক, যে সূর্যে 'কবন্ধের ছায়া' দেখে অভিশাপ-স্খালনের মিথ্যা আশায় 'মরা গঙ্গায়' স্নান করতে নামে; কে সে যে নিজের বিষয়ে বলে : 'নিজের ছায়াভীরু,/ ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরোই'? এতো ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিপতি বা তার প্রসাদভোগী নয় এতো পরাধীন দেশের মধ্যবিত্ত, 'গ্রহণ' শিরোনামায় যার সামন্ততান্ত্রিক অদৃষ্টবাদিতার শিকড়ের আভাস স্পষ্ট। তার ক্ষয়িষ্ণুতার চেহারা যে পৃথক, তা চোখের উপরে দেখা যায়। আবার তার চেতনার দ্বৈধতা যা তার নাগরিক অস্বস্তিতে প্রতিফলিত- ফুটে ওঠে 'সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে / ময়দানে উধাও' হাওয়াতে। যে দীর্ঘদিন 'গ্রীষ্মের পিচে ফেঁপে/ সন্ধ্যায় শূন্যগর্ভ, স্বস্তিহীন' সে তো এই নাগরিক-অথচ-সামন্ততান্ত্রিক সংকটাপন্ন সত্তারই চিত্রকল্প।"[২২]

সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নানাকথা' ১৯৪২ সালে প্রকাশ পায় যখন কবির বয়স চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ। কবির যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন তিনি দেখেছেন গান্ধীজী ৭৯জন আশ্রমবাসী নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে

২০০মাইল দূরবর্তী ডান্ডি অভিযান ও লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন। যা তিনি ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'নানা কথা'র 'রোমন্থন' কবিতায় লিখলেন-

"বয়ঃসন্ধির সময়

মহাত্মাজীর আন্দোলন শুরু হলো।

লবণ আইন ভাঙে, দলে-দলে জেলে যায়,

মাঝে-মাঝে বিপ্লবী বোমা ফাটে,

হাতে হাতকড়া, নানাবিধ রদ্দা, চরম শাস্তি।

বন্ধ সংবাদপত্র, রাস্তায় নিষিদ্ধ পোষ্টার;"

('রোমন্থন', 'নানাকথা')

সেই সময় কবি দেখেছেন শ্রমিকরা, কৃষকরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কারখানায়, কারখানায় ধর্মঘট করছে, কৃষকরা খাজনা বন্ধের জন্য সংগ্রাম করেছ, এই সব কবির মনে প্রভাব বিস্তার করে, তারও প্রভাব পড়েছে 'রোমন্থন'-এ-

"ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ::

কারখানায় ধর্মঘট,

গ্রামে খাজনা বন্ধ করো,

জমিদার, বণিক বরবাদ,

ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ,

অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।"

('রোমন্থন', 'নানাকথা')

এই কবিতায় আমরা কবিকে দেখি তিনি এসব কিছু দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পারছেন কিন্তু তিনি কিছু করতে পারছেন না, একজন নীরব পর্যটক হয়ে নিজের আত্মগ্লানি প্রকাশিত করেছেন মাত্র-

"সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরি নি।

অবশেষে আজ

অসংখ্য নিরক্ষর দুঃস্থের দেশে

নিঃসম্বল পর্যটক মাত্র,"

('রোমন্থন', 'নানাকথা')

এরপর আমরা এই কাব্যের 'হসন্তিকা' কবিতায় দেখবো রাজনীতির ঘৃণ্য খেলা। এই কবিতা সর্ম্পকে মাহবুবুল হক বলেছেন-

"রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে এ ধরণের ব্যঙ্গ প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'হসন্তিকা' কবিতার কথা। এই কবিতায় শ্রমিক আন্দোলনকে 'নৈরাজ্য আর লাল ধ্বংস' হিসেবে আখ্যায়িত করে ভীত শাসকগোষ্ঠী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রচারণাকে ব্যঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন গণতন্ত্রের আশ্বাসবাণী, গান্ধীবাদের মৌনব্রত, ধর্মীয় স্বার্থের সঙ্গে বণিক স্বার্থের গাঁটছড়া, দেশজোড়া স্বার্থান্ধ রাজনীতির ঘৃণ্য লুকোচুরি খেলা, সংগ্রামী জনতার ওপর 'মরণ কামড়ের যন্ত্রণা'র কথা কোথাও তির্যক কোথাও স্পষ্ট ব্যঙ্গে প্রকাশিত"[২৩]

এখন আমরা কবিতাটিকে দেখবো-

"নৈরাজ্য আর লাল ধ্বংস শুধু।

ভোঁতা বর্শায় কাজ নেই আর,

সম্বল, মৌনব্রত, ঈশ্বর, বেনের আশ্রয়।

নেপথ্যে অহরহ আশ্বাসবাণী :

গণতন্ত্র আসন্ন,

সামনে দণ্ড হাতে তারি শিষ্ট দূত,

কয়েকদিনের শান্ত তদারক গরাদের আড়ালে।

কানাকানি; মরণ-কামড়ের মন্ত্রণা

ঘনশ্যাম সন্ধ্যায়।"

('হসন্তিকা', 'নানাকথা')

এই কাব্যেই আমরা পাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা, এবং কমিউনিজমের প্রতি আস্থার প্রকাশ। এখানে তিনি বলেন-

"জানি,এরা বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,

গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ,

তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;

অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল

পিষ্ঠ হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।"

('নানাকথা', 'নানাকথা')

এই কাব্যগ্রন্থটি সর্ম্পকে বলতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

"প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা দলবদ্ধ হতে চেষ্টা করলেন, দু-একখানা পত্রিকাও বেরুল, তারপর যুদ্ধের হাঙ্গামা শুরু, ২২শে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে, কম্যুনিষ্ট পার্টি আইনসংগত হলো (পার্টির কাজ অবশ্য বে-আইনি রইল) সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি গতি পেল, খানিকটা মতিও এসে পরলো বৈকি! মতি যোগাড় দিলে মার্কসিজম। খানিকটা, কারণের মধ্যে সোভিয়েট-প্রীতিটাই বেশি। এগুলো ঘটনা, অতএব তর্কাতীত। এখন প্রশ্নটা হল, আমাদের আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যে মার্কসিজম-এর প্রভাব কতটুকু? আমি এমন উত্তর চাই না যার সাহায্যে কোন বিশেষ রচনাকে প্রগতি (বিপ্লব)-বিরোধী নাম দিয়ে অগ্রাহ্য করতে পারি। যাঁরা পার্টির সভ্য হয়ে কাজে নেবেছেন তাঁদের পক্ষে সূক্ষ্ম মতান্তরতার মূল্য অনেক। সাহিত্যে কিন্তু ততটা মূল্য যখন নেই তখন প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই বিচার্য, অর্থাৎ তারই দ্বারা প্রমাণ হবে প্রভাবটি বেশি না কম।

কবিতাতেই যেন মার্কসিজম প্রচারিত হচ্ছে বেশি। অন্তত সমর সেনের 'নানাকথা', চঞ্চলকুমারের [চট্টোপাধ্যায়] 'বসুন্ধরা', বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ' ও '২২-শে জুন' প্রভৃতি আধুনিক কবিতার বই,"২৪

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'খোলাচিঠি' প্রকাশিত হয় ৪২-৪৩সালে রচিত সাতটি কবিতা নিয়ে। এই কাব্যের 'জাতীয় সংকট' কবিতায় দেখি দুর্ভিক্ষের ছায়া। কবির দিন-রাত্রি কাটে অস্বস্তিতে উৎকন্ঠার সাথে তাই কবি বলেন-

"রাস্তায় রক্তের দাগে

মৃতেরা স্মরণ মাগে।

শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশায়

ট্যাঁকসই সংসার ধীরে-ধীরে লুপ্তপ্রায়,

শবলোভী শকুনেরা স্তব্ধতায় উড়ে যায়।

বাজারে দারুণ ভিড়; দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছাপ

অনেকের মুখে।

ভারতের হৃৎপিন্ডে হানা দেয় বিদেশি বণিক

পূর্বসীমান্তে ক্রমশ জমে পীত সৈনিক।"

('জাতীয় সংকট', 'খোলা চিঠি')

এই কবিতারই শেষে দেখি জাতীয় সংকটের বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিকের সংগ্রামের, মার্কসবাদীদের বিপ্লবের কথা-

"মধ্যদিনে গান বন্ধ করে পাখি।

কারখানায় সঙ্ঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়,

হাতে বিপ্লবের রাখি!

পোড়ামাটিতে অস্ত্রহাতে প্রহরী জাগে ক্ষুধিত কিষাণ।

ভয়াবহ রণক্ষেত্রে লালসৈন্য ঢালে প্রাণের আবির।

সহসা মধ্যদিনে বাজে কালের বিষাণ।"

('জাতীয় সংকট', 'খোলা চিঠি')

সমর সেনের পঞ্চম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ 'তিন পুরুষ'। এই কাব্যগ্রন্থের 'গৃহস্থবিলাপ' কবিতার একেবারে শেষে দেখি কবি নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ত্যাগ করতে চেয়েছেন। তিনি মিশতে চেয়েছেন সমাজের নিচু তলার খেটে খাওয়া মানুষের সাথে, কারণ তিনি জানতেন এরাই কালের সারথি, তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য কবি ব্যাকুল হয়ে বলেছেন-

"অকাল মরণ শেষে এ কাল সমরে!

তোমাকে জানাই বন্ধু;

পথে বাধা পর্বত আকার,

ঘুণধরা আমাদের হাড়,

শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু

আশা আছে বাঁচবার।

যারা মাঠে খাটে,

উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে

মাছ ধরে যারা আনে হাটে,

ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা

আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে

সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,

তাদের মিতালি খুঁজি।

তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,

হয়ত মলিন

নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,

তবু তারা কালের সারথি,

তাদের দোস্তি, তাদের গতি

আমার পরমা যতি।"

('গৃহস্থবিলাপ', 'তিন পুরুষ')

এরপর এই কাব্যেরই শেষ কবিতা '২২শে জুন ১৯৪৪' কবিতার একেবারে শেষে এসে আমরা দেখতে পাই কবির মুখে আশার বাণী। তিনি চেয়েছেন মানুষের এই ক্লান্তির সফর শেষ হোক-

"আশা রাখি একদিন এ-কান্তার পার হয়ে পাব

লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের

গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,

পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ট নগর,

বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত সফর।"

('গৃহস্থবিলাপ', 'তিন পুরুষ')

সমর সেন এরপর আর কবিতা লেখেননি। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সমর সেনের কবিতা লেখা

ছেড়ে দেবার ব্যাপারটি হয়তো আঁচ করতে পরেছিলেন তাই তিনি 'তিন পুরুষ' আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন-

*"কবির ব্যক্তিস্বরূপের অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং সেই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শ্রেণীসমাজের অনবরত বিরোধ, একাত্মতা উপলব্ধির এই পদ্ধতিকে সর্বদাই সংকটসংকুল করে রাখে। সংকটের এই আর্বতে তাই কবির পক্ষে শেষ পর্যন্ত দুটি পথ খোলা থাকে : হয় তিনি এই সংঘাতের মধ্যেই নতুন সংহতির ভিত রচনা করে সামাজিক অগ্রগতিকে রক্তমাংসে সঞ্জীবিত করে তুলবেন, আর তা না হলে, অন্ধ ঘূর্ণিপাকের জটিলতায় তিনি তলিয়ে যাবেন এবং হয়ত শেষকালে পালিয়ে বাঁচবেন কিংবা হার মেনে কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন।"*২৫

এইভাবে সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেও তিনি কিন্তু চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে এই মাত্র পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ লিখেই অমর হয়ে থাকলেন। তিনি প্রথম জীবনের তুলায় শেষের দিকেই যেন পার্টির প্রতি যেন বেশি ঝুঁকে পরেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা তিনি মেটাতে পারলেন না। তাই একটা আপত্তি তো থেকেই যায়। আর সেই আপত্তির জায়গা থেকেই আমরা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য দিয়েই শেষ করবো-

"তাঁর বিদ্রোহে আমার আপত্তি নেই। আপত্তি তাঁর অভিমানে, আপত্তি তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাসনে।" ২৬

তথ্যসূত্র:-

১। 'কার্ল মার্কস জীবন ও চিন্তা,' সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, পঞ্চম সংস্করণ:এপ্রিল ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-২৮

২। 'বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক সমর সেন', সম্পাদনা-পুলক চন্দ, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ:এপ্রিল ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-১৯

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১৮

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১৯

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪

৬। 'তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য', মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, নয়া উদ্যোগ, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

৭। 'বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক সমর সেন', সম্পাদনা-পুলক চন্দ, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ:এপ্রিল ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৩৬

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৪২

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৭

১১। 'আমার কালের কয়েকজন কবি', জগদীশ ভট্টাচার্য, পুনর্মুদ্রণ:আগস্ট ২০০৪, ভারবি, পৃষ্ঠা-২৫১

১২। 'বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক সমর সেন', সম্পাদনা-পুলক চন্দ, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ:এপ্রিল ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-২৯

১৩। 'সংকলিত সমর সেন', সম্পাদনা-সব্যসাচী দেব সোমেশ চট্টোপাধ্যায়, পরিবর্দ্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা-২১৪

১৪। 'তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য', মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, নয়া উদ্যোগ, পৃষ্ঠা-১০১

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১০১

১৬। 'কয়েকটি কবিতা সমর সেন', সম্পাদনা-সব্যসাচী দেব, তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ:আগস্ট ২০১২, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা-৮২

১৭। 'তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য', মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, নয়া উদ্যোগ, পৃষ্ঠা-১০২

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১০২

১৯। 'কয়েকটি কবিতা সমর সেন', সম্পাদনা-সব্যসাচী দেব, তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ:আগস্ট ২০১২, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০

২০। তদেব, পৃষ্ঠা-৮০-৮১

২১। তদেব, পৃষ্ঠা-৯০

২২। 'অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক', দ্বাবিংশ বর্ষ:দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৮৮, সম্পাদনা-পুলক চন্দ, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩

২৩। 'তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য', মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, নয়া উদ্যোগ, পৃষ্ঠা-১২৪

২৪। 'নানাকথা সমর সেন', সম্পাদনা-সব্যসাচী দেব, তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ:আগস্ট ২০১২, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা-৭০

২৫। 'তিন পুরুষ সমর সেন', সম্পাদনা-সব্যসাচী দেব, তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ:আগস্ট ২০১২, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা-৫৬

২৬। 'বাংলা কবিতার কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ:অক্টোবর ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-২২৫